মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার। **মানবাধিকার** প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা।[১] যদিও অধিকার বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয় তা এখন পর্যন্ত একটি দর্শনগত বিতর্কের বিষয়।[২] বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের বিষয়টি এখন আরো প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে, যখন আমরা দেখছি যে, মানুষের অধিকারসমূহ আঞ্চলিক যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানির কারণে বার বার লংঘিত হচ্ছে। **প্রথমত** একটি পরিবার ও সমাজের কর্তারা তাদের অধিনস্তদের অধিকার রক্ষা করবে। **দ্বিতীয়ত** রাষ্ট্র এবং **তৃতীয়ত** আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানবাধিকার হচ্ছে কতগুলো সংবিধিবদ্ধ আইন বা নিয়মের সমষ্টি, যা মানব জাতির সদস্যদের আচার আচরণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় এবং যা স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক আইন সমষ্টি দ্বারা সুরক্ষিত যা মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিষয় হিসেবে ধর্তব্য।[৩] এতে কোন মানুষ এজন্য সংশ্লিষ্ট অধিকার ভোগ করবে যে, সে জন্মগতভাবে একজন মানুষ।[৪] অন্যকথায় বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য মানুষের যেসকল অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত তাদেরকে মানবাধিকার বলে
জাতিসংঘের Universal Declaration of Human Rights এর ১ম অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে যে,

> All human beings are born free and equal in dignity and rights.

অর্থাৎ ‘জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।’[৫] বর্তমান বিশ্বে Human Rights শব্দটি বহুল আলোচিত ও বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। মানবাধিকারের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হলেও সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এ নিয়ে চলছে বাক-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত। একদিকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে মতাধর শাসকরা দেশে দেশে জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলো পর্যন্ত অবলীলায় হরণ ও দমন করে চলছে। আর দুর্বল জাতিগুলোর সাথে সবল জাতিগুলোর আচরণ আজকাল মানবাধিকারকে একটি উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে।[৬]

মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

সাইরাস সিলিন্ডার

৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের রাজা দ্বিতীয় সাইরাস যিনি সাইরাস দ্য গ্রেট’নামে সমধিক পরিচিত ব্যাবিলন আক্রমণ করেন। ব্যাবিলন আক্রমণের পর তিনি ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা নির্যাতিত দাস জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করে দেন। তাদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনেরও ব্যবস্থা করে দেন। অতঃপর সাইরাসের নির্দেশে একটি সিলিন্ডার তৈরি করা হয়। যা সাইরাস সিলিন্ডার নামে অভিহিত। এতে

সাম্রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এটিই বিশ্বের প্রথম মানবাধিকার সনদ।

মদীনা সনদ

মানবাধিকারের প্রধান ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী কর্তৃক মদীনা সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। মদীনা সনদকে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ সনদে মোট ৪৭ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলোতে মানবাধিকারের বিষয়গুলো সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদসমূহ:

- সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সব সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
- সব নাগরিক পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
- নাগরিকদের অধিকার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
- সকল প্রকার রক্তক্ষয়, হত্যা ও ধর্ষণ নিষিদ্ধ।
- কোনো লোক ব্যক্তিগত অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। তার কারণে অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।
- দুর্বল ও অসহায়দের সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

ম্যাগনা কার্টা

মানবাধিকারের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ম্যাগনা কার্টাকে একটি মাইলফলক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এটি মানবাধিকারের মহাসনদ হিসেবে ইতিহাসে অভিহিত। এটি ছিলো মূলতঃ ইংল্যান্ডের রাজা জন ও ধনী বিত্তশালী ব্যারনদের মধ্যে ১২১৫ সালে সম্পাদিত একটি চুক্তি। এতে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিলো যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাউন্সিলের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে খামখেয়ালীভাবে জনগণের উপর কর আরোপ করা যাবেনা। রাজকর্মকর্তারা যথেচ্ছভাবে জনগণের ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে না।ব্যাবসায়ীরা রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছেমতো একস্থান হতে অন্য স্থানে চলাফেরা করতে পারবে। কোনো স্বাধীন মানুষকে বিচারিক রায় বা দেশীয় আইনানুযায়ী ব্যাতীত গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধকরণ, সম্পত্তিচ্যুত, দীপান্তরিত বা নির্বাসিত কিংবা হয়রানির শিকার করা যাবে না।

এই ম্যাগনা কার্টা চুক্তির মধ্য দিয়েই সংসদীয় গণতন্ত্রের পাশাপাশি আইনের শাসনের ধারণার যাত্রাও শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক সনদেই বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় কোনো দেশের রাজাসহ সে দেশের সকলেই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন। প্রজাদের অধিকার ও রাজার ক্ষমতা হ্রাসের যৌক্তিক এ দলিল পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহুদেশে মানবাধিকার ও জনগণের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসেকে কাজ করেছে।

পিটিশন অব রাইটস

১৬শ শতকে ব্রিটিশ জনগণের আন্দোলনের ফলে প্রথম যে তাৎপর্যপূর্ণ দলিলের সৃষ্টি হয় তা পিটিশন অব রাইটস নামে অভিহিত। ১৬২৮ সালে পিটিশন অব রাইটস সংসদ কর্তৃক আইনের আকারে গৃহীত হয়েছিলো। পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া করারোপ, বিনা অপরাধে কারারুদ্ধকরণ, ব্যক্তিগত বাসস্থানে স্বেচ্ছাচারী অনুপ্রবেশ এবং সামরিক আইনের প্রয়োগ থেকে জনগণকে সুরক্ষা প্রদান করেছিলো মানবাধিকারের এ গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি।

বিল অব রাইটস

১৬৮৯ সালে বিল অব রাইটস ব্রিটিশ পার্লমেন্টে গৃহীত হয় ও বিধিবদ্ধ আইনে রূপান্তরিত হয়। মানুষের মৌলিক মানবাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ারের মতে, বিল অব রাইটস প্রত্যেক মানুষকে সেই সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার পুনরুদ্ধার করে দিয়েছে যেগুলো থেকে তারা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসক থেকে বঞ্চিত ছিলো। যেমনঃ জীবন ও সম্পত্তির পূর্ণ স্বাধীনতা, লেখনী দ্বারা জাতির নিকট কথা বলার অধিকার, স্বাধীন লোকদের দ্বারা গঠিত জুরি ছাড়া আর কারো দ্বারা ফৌজদারী অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন না হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণভাবে যেকোনো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়, বিল অব রাইটস ঘোষণা করে, পার্লামেন্টের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রাজা যদি কোনো আইনকে স্থগিত বা ভঙ্গ করেন অথবা রাজা তার খরচের জন্য ইচ্ছেমত করারোপ করেন বা রাজ-কমিশন বা রাজ-আদালত গঠন করেন তাহলে এগুলো হবে বেআইনি ও ধ্বংসাত্মক।

মানবাধিকার মানবাধিকারের ধারণাটি আঠারো শতকে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশকালের ফসল। তবে সমসাময়িক মানবাধিকারের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। মৌলিক অধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটে মূলত 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' (ইউডিএইচআর)-এর মাধ্যমে, যা ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বংসযজ্ঞের অভিজ্ঞতা থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক একটি সনদ হিসেবে গৃহীত হয়। তবে মানবাধিকারের আলোচনা বিশ্বব্যাপি প্রসার লাভ করে বিশ শতকের চল্লিশ থেকে নববইয়ের দশকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। বর্তমানে যেকোন বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকারের ধারণা একটি প্রাথমিক কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

প্রাকৃতিক অধিকার থেকে মানবাধিকার মানব ইতিহাসের ব্যাপক পরিসরে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ রূপলাভ করে সমাজের সদস্য হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট দল বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সে প্রতিষ্ঠান হতে পারে পরিবার, সম্প্রদায়, ধর্ম, পেশাগত গ্রুপ ইত্যাদি। ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি মানুষ তার মানব অস্তিত্বের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে মানবাধিকার পাওয়ার যোগ্য, এ ধারণাটি সাম্প্রতিক হলেও বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা এবং প্রধান ধর্মীয় অনুশাসনের মূলে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক কাল থেকেই সর্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তিমূল হিসেবে প্রাকৃতিক আইনকে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যেসব সংগঠক রয়েছে তা বিভিন্ন সময়ে এবং পরিসরে ধর্মীয় এবং নৈতিক অবস্থান হতে জৈবিক ও সামাজিক রীতিনীতির স্থিরতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক অধিকার এবং ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে পরিস্কার ধারণা দেন, যা মূলত প্রাকৃতিক আইন হতে উদ্ভূত এবং বিশ্বে বিদ্যমান প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার একটি ঐশ্বরিক ভিত্তি ছিল যা

সৃষ্টিকর্তা বা বিধাতার ইচ্ছা হিসেবে ধরা হয়। এ ব্যাপারে একটি পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় সার্বভৌম প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা হতে, যা সতেরো এবং আঠারো শতকের ইউরোপের বহু দার্শনিক তাদের লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রে প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রণেতা তত্ত্ববিদগণ প্রাকৃতিক আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার মাধ্যমে একে বিস্তৃত করে মানব সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক অধিকারকে আরো সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আঠারো শতকের দার্শনিক জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিস্তৃতির দ্বারা সামাজিক চুক্তি মতবাদের যে নতুন ধারা তৈরি হয় তা পরবর্তীতে মানবাধিকার তত্ত্বের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিতীয় চুক্তিতে (১৬৮৯) তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিধাতার বা প্রকৃতির সৃষ্টি হিসেবে প্রতিটি মানবসত্তা প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন এবং সমঅধিকার সম্পন্ন। সুতরাং জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার ছিল, এবং প্রাকৃতিক আইন ব্যবহার করে তারা জীবনের এবং সম্পত্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করত। কাল্পনিকতা সত্ত্বেও লকের প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা আধুনিক ধারার অধিকারের ধারণার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে ১৭৭৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করা যায় যেখানে প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ গ্রহণ করে বলা হয়েছিল, সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হয়েছে এবং সেই সাথে প্রকৃতিগতভাবে অখন্ডযোগ্য কিছু অধিকার লাভ করেছে যার মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অনুসন্ধানের মতো অধিকার।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভের অল্প কিছুদিনের মধ্যে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রাথমিক ভিত্তির দলিলটি গৃহীত হয়। বাধ্যবাধকতাহীন এই দলিলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একনায়ক সুলভ ক্ষমতার ব্যবহার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল। বিশ্বের সবগুলো মহাদেশের এবং ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির দ্বারা গবেষণার মাধ্যমে এবং প্রতিটি অধিকার আলাদা অংশে বিভক্ত করে সর্বজনীন মানবাধিকার তত্ত্বটি প্রস্তুত হয়। সর্বজনীন মানবাধিকার তত্ত্বে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, যা সমগ্র মানব সত্তার সাথে জড়িত। ইউডিএইচআর-এর ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন অবস্থায় সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে অর্থনীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। সব অধিকারের সমন্বয়ে প্রণীত ইউডিএইচআর-এ আশা করা হয়েছিল যে, মৌলিক অধিকারসমূহ অবিচ্ছেদ্য এবং অলঙ্ঘনীয় ভাবে তৈরী। ইউডিএইচআর-এ ঘোষিত মানবাধিকারের ধারণা পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে কখনও পূর্ণ সমর্থন পায়নি, এমনকি পরবর্তীতে এ ধারণার বিপক্ষে তাদের কাছ থেকে আপত্তিও এসেছে।

বছর পরিক্রমায় বিভিন্ন কভেন্যান্টস এবং সনদ দ্বারা ইউডিএইচআর-এ বর্ণিত মানবাধিকারের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে কাঠামোগতভাবে আরো বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন যৌথ অধিকার এবং অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠক বিশেষ করে বহুজাতিক কর্পোরেশন সমূহের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে।

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার দ্বারা কে অধিকার ভোগ করবে এবং সেটা কোন প্রকার অধিকার তা নির্ধারণ করা হয়নি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে উপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কঠোর আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এ প্রশ্নও উঠে আসে যে অধিকার কার, এবং কোনো নারী বা পুরুষ কী ধরণের অধিকার লাভ করবে। ফলে এ সময়ে অধিকারের এই

দুই ধরণের ধারণার সমন্বয়ে নতুন একটি ধারা তৈরী হয় (Lauren-in-Cimel)। কোনো একটি মৌলিক মানবাধিকার কিভাবে অর্জিত হয় এবং কোন অংশটি অহস্তান্তরযোগ্য, এই দুটির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে। মূলত এ আন্দোলন জাতিগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার বিরোধকে উদারমতাবলম্বী অধিকারের আন্দোলনের ধারণা দ্বারা সুদৃঢ় করে তোলে।

মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিতর্কে জাতীয়তাবাদীরা ব্যক্তি অধিকারের চেয়ে কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বেশী প্রাধান্য দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উপনিবেশবাদ বিরোধী কর্মী নাইজেরিয়ার মবোনু ওজিক দাবি করেন যে, মাতৃভূমিতে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ব্যক্তির একটি প্রাকৃতিক অধিকার। হো চি মিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণাকালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণায় বিধৃত জনগণের অনন্য-সমর্পনীয় অধিকারের উদ্ধৃতি দেন। পশ্চিমা দেশগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৫২ সালে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের বিষয়টির প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করে। ইউরোপের দেশগুলো এবং নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা জীবন ধারনের অধিকার, স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকারের মতো মৌলিক মানবাধিকার ধারণার সাথে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারকে সমমর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে দ্বিমত পোষণ করেন। বিরোধীদের মধ্যে বেশিরভাগই তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রতি সন্দেহ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিশ্বায়ন, এনজিও এবং নতুন জাত্যতিশায়ী মানবাধিকার শাসনকাল উনিশ শতকের সত্তুরের দশকে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মানবাধিকারের বিষয়সূচী এবং ক্ষমতার ধারণার ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবর্তন আসে। পশ্চিমের বাজার অর্থনীতির নিরীখে কমিউনিজম প্রবর্তনের দ্বারা মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ সময়ে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশগুলোর ধারণাকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারকে (যা প্রথম প্রজন্মের অধিকার বলে বিবেচিত) মৌলিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকে (যা দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলে বিবেচিত) অনুরূপ স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ বিভাজনই মূলত তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্লকের মধ্যে একটি বিভাজক ত্রুটিরেখা হিসেবে দেখা দেয়। অধিকারের এই ধারণা দ্বারা এ সময়ে বিশ্বব্যাংকের বাজার প্রসারের বিরোধিতাকারী এজেন্ডার আলোচনাকে সামনে নিয়ে আসা হয়।

একইভাবে মানবাধিকার রক্ষার যে মূল কার্যক্রম জাতিসংঘের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল তা আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে স্থানান্তরিত হয়। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের তুলনায় এনজিও কার্যক্রম মৌলিক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ক্ষুদ্রতর পরিসরে হলেও মানবাধিকারের আন্তঃদেশীয় শক্তিশালী একটি সমর্থক গ্রুপ তৈরি হয়, যারা নিজ নিজ সরকারকে চাপের মধ্যে রেখে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করে। এই গোষ্ঠী অধিকারের কার্যক্রমের ফলে শাসক কর্তৃক ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পর মানবাধিকার কার্যক্রমের ভাষা এবং অর্থ দুটোই পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবাধিকার। বিশ শতকের শেষ দ'ুদশকে বসনিয়া এবং রুয়ান্ডার নির্বিচার হত্যাকান্ড, বিশ্বায়ন, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের শাখা প্রশাখার বিস্তৃতির প্রভাবের সাথে সাথে নতুন করে সৃষ্ট সুশাসনের ভাষা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকারের ধারণার অনুপ্রবেশ মানবাধিকারের ধারণাকে

বিশ্বব্যাপি প্রসারিত করেছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও এটি একটি বাস্তব ঘটনা। জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি সম্মেলনে, বিশেষ করে নারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোতে শুধু নারী অধিকার সংরক্ষণ হয়নি বরং মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ভিয়েনা সম্মেলনে মানবাধিকারের বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

এ সময় দেখা যায়, দক্ষিণের বহুমুখি এনজিওগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে যাচ্ছে। এদের কোনটি পশ্চিমা অর্থায়নে স্থাপিত এবং তাদের অর্থায়নের উপর নির্ভর করেই চলছে, আবার কিছু এনজিও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে। যৌথভাবে এরা অধিকারের ধারণার বিশ্ব দৃশ্যপটকে পরিবর্তন করছে, মানবাধিকারের বিষয়টি ব্যাপকতর করছে এবং পরিবেশের অধিকারের ইস্যু থেকে স্বাস্থ্যের অধিকারের ইস্যু, অর্থনৈতিক ন্যায়নিষ্ঠতা, বহুজাতিক দায়দায়িত্ব প্রভৃতি ইস্যুকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপনিবেশিক এবং প্রাচ্যের কাঠামো ভিত্তিক জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ও সংগঠিত হয়ে কতগুলো সামাজিক প্রথার স্বীকৃতির ফলে অন্যান্য মানবাধিকার যথেষ্ট উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সমালোচকগণ অভিযোগ করেন যে, ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান বৈশ্বিক শক্তির সম্পর্ককে যথাযথ বিবেচনা ব্যতিরেকে সর্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-বাস্তববাদ বির্তক উপলব্ধি করা যাবে না। এই ইস্যু শুধু সংস্কৃতি ভিত্তিক মানবাধিকার চর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ক্ষমতার অনুশীলনের রাজনৈতিক রূপকেও সামনে নিয়ে আসে।

এটা নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা যায় যে, সর্বত্র স্বীকৃত কতগুলো কারণ নারী অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তৃতি রোধে কোনো সংস্কৃতিতে সার্বজনীন অধিকারের দাবিতে এমন সব বিরোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় যার দ্বারা মানবাধিকারের ধারণাটিকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় আবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আফ্রিকার নারীদের বিশেষ অঙ্গ কর্তনের (এফজিসি) মতো বিষয়ের প্রচলন তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ হলেও তা পিছিয়ে পড়া আফ্রিকার সংস্কৃতিগত প্রথা বলে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে বহুল প্রসারিত স্বামী-স্ত্রী বিরোধ এবং জীবনসঙ্গী হত্যার মতো বিষয় 'সংস্কৃতিগত অপরাধ' বলে গণ্য হয়, যা ইউরোপ-আমেরিকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে প্রতিফলিত হয় না। একইভাবে সার্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-আপেক্ষিকতা সংশ্লিষ্ট দ্বৈত মতবাদ থেকে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, কোনো একজন ককেসাস নারীকে তার পুরষসাথী কর্তৃক হত্যার পরও সেটাকে আমেরিকায় কেন গৃহবিবাদ হিসেবে ধরা হয়, অথচ একজন আরব নারীকে তার স্বামী হত্যা করলে সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বলে গণ্য হয়, যা তাদের সংস্কৃতিতে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সর্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-বাস্তববাদ বিতর্ক ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক জাতিসংঘের তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইউরো-আমেরিকান নারীবাদীগণ এফজিসিকে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেন, যা আফ্রিকার নারীদের ভোগ করতে হয়। আফ্রিকার নারীবাদীগণ যেখানে আলোচনার বিষয়সূচী হিসেবে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সমন্বয়মূলক নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে পানি এবং জ্বালানীর মতো প্রয়োজনীয় জিনিস বহনের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করে তখন তারা তার বিরোধিতা করে। আফ্রিকার নারীবাদীগণ আভিযোগ করেন যে, এফজিসি'র প্রতি অসামঞ্জস্যমূলক গুরুত্বারোপ করার পিছনে ইউরো-আমেরিকান নারীবাদীদের দুই ধরনের কারণ রয়েছে: (১) সাম্প্রতিক সময়ের জটিল বিশ্ব অর্থনৈতিক রাজনীতিতে আফ্রিকানদের প্রভাব বিস্তার করতে না দেয়া এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, যার মধ্যে আফ্রিকান নারীদের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত; (২) এর সাথে রয়েছে ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতির প্রসারের উপনিবেশিক প্রবণতা, এবং আফ্রিকান

নারীদের অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের জাহির করা। সবগুলো দিকের বিশ্লেষণে তাই বলা যায় যে, সার্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-বাস্তববাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হবার মতো বিষয়ের বাইরেও মতবাদগত বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ক্ষমতার হস্তান্তরের বৈশ্বিক পরিবর্তনের দ্বারা আন্তর্জাতিক নারীবাদীগণ সময়ের ব্যবধানে দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আংশিকভাবে দূর করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্মেলনে দক্ষিণের এনজিওগুলো এবং নারীবাদীগণ বলিষ্ঠভাবে মানবাধিকারের কথা বলে, যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফোরামে দৃঢ়তার সাথে মানবাধিকারের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বলা যায়, এই সময়ের পর থেকেই মানবাধিকারকে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় কাঠামোবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে মানবাধিকারের ব্যাপারটি সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ না করে বরং প্রধান কিছু নীতিগত উপাদান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

ভিয়েনা ঘোষণা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, নারীর অধিকার মানবাধিকারের অংশ। এর সঙ্গে মানবাধিকারকে আরও নিশ্চিত করা হয়েছে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রর্দশন এবং মৌল স্বাধীনতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শক্তিশালী করে নিজেদের মধ্যে চালু রাখার উপর জোর দেয়ার মধ্য দিয়ে।